Bangladesh Journal of Integrated Thoughts, 2023
DOI: 10.52805/44h9yh71

বই রিভিউ

বিশ্বাসের দার্শনিকতা ও ইসমাইল রাজির 'আত তাওহিদ'

মুসা আল হাফিজ[১]

ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত ধারণা এবং কেন্দ্রীয় বিষয় নিয়ে দার্শনিক অনুসন্ধানকে আমরা ধর্মদর্শনের মূলে দেখতে পাই। যদিও তা ধর্মীয় প্রাচীন পাঠ্যসমূহকে ঘিরে আবর্তিত হয়, তবে এর সাথে যুক্ত আছে জ্ঞানতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি। যা একই সাথে প্রাচীন ও আধুনিক। সামগ্রিকভাবে ধর্মের ব্যাপারটিও তাই। কে ধর্মকে প্রাচীন আসবাবের খাতায় তালিকাভূক্ত করবে? মানুষের জীবনকে ঘিরে আবর্তিত মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক জিজ্ঞাসাগুলোর মধ্যে ধর্মলগ্ন বিষয় একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে। মানুষের কল্যাণ ও ভাগ্য নির্ধারনে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে ধর্ম অতীতে যেমন সক্রিয় ছিলো , আজও আছে। সেই সক্রিয়তা মানুষকে গভীর অর্থে সত্য ও সত্তার অন্তর্দৃষ্টি ও বিস্তৃত জ্ঞানলাভে সক্ষম করে তুলেছে।

ঈশ্বরের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস, বিভিন্নরকমের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক, ভালো ও খারাপ – এর প্রকৃতি ও পরিসর এবং জন্ম, ইতিহাস ও মৃত্যুর ব্যাখ্যায় ধর্মের প্রভাব এক চিরন্তন বাস্তবতা। ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার নৈতিকতা ও মূল্যবোধ , বিশ্বাসের এর সাথে যুক্তি, অভিজ্ঞতা আর ঐতিহ্যের সম্পর্ক; অলৌকিকতা, পবিত্র বাণী, বৈরাগ্যবাদ, ক্ষমতা আর পরিত্রাণ – ধর্মদর্শনের আওতাধিন বিষয়।ধর্মকে এড়িয়ে এসব বিষয়ে মানুষের অগ্রগতি একান্তই সীমিত, বিকলাঙ্গ। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, মিশরিয় দর্শন, তাওবাদ, কনফুসিয়াসবাদ কিংবা পিথাগোরাসবাদ, এরিস্টটল - প্লেটোনিজম থেকে নিয়ে আধুনিক দার্শনিক থমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) জন লক (১৬৩২ – ১৭০৪) জর্জ বার্কলি (১৬৮৫ - ১৭৫৩) ; কে এড়াতে পেরেছেন ধর্মের প্রভাব?

অ্যারিস্টটল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪ – খ্রি.পূ. ৩২২) তার মেটাফিজিক্স-এ শাশ্বত গতির পূর্বজ কারণ হিসেবে নিশ্চল চালক-কে (unmoved mover) দায়ী করেছেন, যিনি আকাঙ্খার বা চিন্তার বস্তুর মত, নিজে না চালিত হয়ে অন্য বস্তুকে চালিত করেন। এরিস্টোটলের মতে, খোদা হলেন ধর্মতত্ত্বে আলোচনার মূল বিষয়।বারুখ স্পিনোজার

[১] Centre for Islamic Thought & Studies, Jatrabari Email: 71.alhafij@gmail.com

(১৬৩২-১৬৭৭) দর্শনে কমহীন খোদার ভাবধারা প্রতিফলিত, যার উপর আস্থা রেখেছিলেন বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আইনস্টাইনও (১৮৭৯ - ১৯৫৫)।

উত্তরাধুনিক দার্শনিক ইসমাইল রাজী আল ফারুকীর দার্শনিকতায় সঙ্গতকারণেই ধর্ম কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে এবং তার ধর্মদর্শনের কেন্দ্রে আছে খোদার একত্ব-তাওহিদ।তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন বিশ্বব্যক্তিত্ব এবং সমানমাত্রায় একজন দার্শনিক হিসেবে ইসমাইল রাজী ধর্ম ও দার্শনিক অভিজ্ঞানসমূহের মূলীভূত শিক্ষা ও সত্যকে নিংড়ে দিশানির্দেশের প্রয়াসে ছিলেন অগ্রণী। ১৯২১ সালে ফিলিস্তিনের জাফফা শহরে জন্ম নেয়া এ মনীষী আপন সময়ে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে কর্তৃপক্ষীয় কণ্ঠস্বরের অধিকারী হলেও তাকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে কমই। যে অর্থে ফিলিস্তিনী-আমেরিকান বুদ্ধিজীবী এডওয়ার্ড সাঈদ (১৯৩৫ – ২০০৩) আমাদের জ্ঞানকাণ্ডকে দুলিয়ে দেন , তার চেয়ে অধিক অর্থ নিয়ে ফিলিস্তিনী -আমেরিকান বুদ্ধিজীবী ইসমাইল রাজী ফারুকী দুনিয়ার চলতি ভাবনাসমূহকে চ্যালেঞ্জ করেন। গলতি নির্দেশ করেন এবং বিকল্প প্রস্তাব করেন।

এডওয়ার্ড সাঈদের মতো তিনিও ফিলিস্তিন থেকে হন বাস্তুচ্যুত। ইসরাইলি দখলদারির অসহায় শিকার হয় তার বসতি, গৃহ। পিতা ছিলেন ইসলামী বিশেষজ্ঞ। তার কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে ফিলিস্তিনে কলেজ-জীবন শেষ করে বৈরুতে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন দর্শন নিয়ে। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে লাভ করেন পিএইচডি ডিগ্রি। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম ও ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্রিস্ট ধর্ম ও ইহুদীধর্মের উপর পোস্ট গ্রাজুয়েট করেন। মন্ট্রিলের ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় সহ উত্তর আমেরিকার বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে করেন অধ্যাপনা। করাচিতে কাজ করেন ইসলামিক ইন্সস্টিটিউট অব অব ইসলামিক রিসার্চ এ । আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ। দশ বছর ছিলেন এর সভাপতি। ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন মুসলিম -ইহুদী -খ্রিস্টান কনফারেন্সের, প্রেসিডেন্ট ছিলেন শিকাগো আমেরিকান ইসলামিক কলেজের।বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দেন জ্ঞানের ইসলামিকরণ আন্দোলনে।

তাঁর সবচেয়ে বরেণ্য কাজ তাঁর কলমী চর্চা। পঁচিশটি অনবদ্য গ্রন্থ এবং শতাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিসন্দর্ভ তাকে সমকালিন বিশ্বের অন্যতম দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তার সবচেয়ে বিখ্যাত বই – Christian Ethics: A Historical and Systematic Analysis of Its Dominant Ideas (১৯৬৮) Islamization of Knowledge (১৯৮২) Islam and Other Faiths (১৯৮৫) Trialogue of the Abrahamic Faiths, (১৯৮২)

১৯৮৬ সালে নৃশংস ছুরিকাঘাতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তাওহিদের সত্যস্বরূপকে তিনি দার্শনিক বয়ানে ভাষাদান করতে চেয়েছেন তার বিখ্যাত Tawhid: Its Implications for Thought and Life (১৯৮২) গ্রন্থে। বাংলায় যার অনুবাদ করেছেন কথাশিল্পী শাহেদ আলী (১৯২৫ - ২০০১); আত তাওহিদ : চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য গ্রন্থে। বইটি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বি.আই.আই.টি), (আইএসবিএন নম্বর, 9848203141, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০) । দুনিয়াব্যাপী বইটির বরেণ্যতা স্বীকার করেও এটা বলতে হয় যে, শাহেদ আলীর নিপুণ অনুবাদ বইটিকে করে তুলেছে অধিকতরো সুখদ ও বর্ণময়। ফারুকীর ভাষাবৈদগ্ধকে ধারণ করেও শাহেদ আলী কথাশিল্পে আপন শৈলীর অধিকারে অনুবাদে রেখেছেন বর্ণিলতার সেই ছাপ, যা তার অনুবাদকে দেয় নিজস্ব নির্মাণের বৈভব। বিষয়ের ভারত্ব ও বর্ণনার দার্শনিকতার ফলে চিন্তাশীল পাঠকের কাছে বইটির পাঠ হবে বিচিত্র ও ঋদ্ধ এক অভিজ্ঞতা।

বইটির কেন্দ্রীয় বিষয় তাওহিদ। ধর্মের ইতিহাসে তাওহিদ মাতৃপ্রসঙ্গ। ইসলাম তো বটেই, অন্য সব ঐশ্বরিক ধর্ম তাওহিদের উপর ভিত্তি করেই আত্মপ্রকাশ লাভ করে।ইসলাম-পূর্ব ধর্মসমূহে পরবর্তি বিকৃতিসত্তেও এর স্বাক্ষর রয়ে গেছে । ইসলাম তার অস্তিত্বের সবটুকু দিয়ে তাওহিদকে নিশ্চিত করে , এর বিকৃতির পথ সমূহ রুদ্ধ করে এবং একে জীবনবোধ ও ধর্মস্থাপনার কেন্দ্রে রেখে প্রতিটি বিধান ও অভিব্যক্তিকে চালিত করে। ইসলামে তাওহিদ তত্ত্বে ও ব্যবহারে সুরক্ষিত এবং এর উপর প্রধানত নির্ভর করে ইসলামের জীবনাবেদন।

তাওহিদ-বয়ানে ইসমাইল রাজী শুরুতে প্রত্যাখান করেন গ্রীকদের সেই চিন্তাকে, যা মুসলিম দার্শনিকদের একাংশকে প্রভাবিত করেছিলো, তারা এরিস্টটলের ঈশ্বরের সাথে ইসলামের আল্লাহকে মেলাতে চেয়েছিলেন। এরিস্টটলের ঈশ্বর সৃষ্টির প্রথম কারণ বটে, কিন্তু এরপরে কর্মহীন , ভূমিকাহীন। আবু ইসহাক আল কিন্দি (আনু. ৮০১ – ৮৭৩) আবু নসর মুহাম্মদ আল ফারাবি (৮৭০/৭২২-৯৫০ খ্রি.) বা আবু আলী হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা (৯৮০ - ১০৩৭) ইসলামের সাথে গ্রীক চিন্তার সমন্বয়ের যে চেষ্টা করেছেন, সেখানে ইসলামী ধর্মদর্শন সঙ্গতকারণেই প্রতিক্রিয়া দেখায়। আধুনিক দুনিয়ায় গ্রীক খোদাভাবনা যখন নতুন মোড়কে কথা বলছে, দুনিয়ার চালক হিসেবে কতগুলো প্রাকৃতিক আইন দিয়েই খোদার কাজ শেষ মনে করা হচ্ছে, ইসমাইল ফারুকী তখন আল্লাহর খালিকিয়্যত বা স্রষ্টাসুলভ কাজ এবং রবুবিয়্যত তথা জগতের প্রতিপালকসুলভ কাজ সমূহকে ব্যাখ্যা করেন, যুক্তিভাষ্যে প্রতিষ্ঠা দেন।

স্রষ্টা সব সময় তার কাজ করছেন, নিজে অথবা তারই তৈরী উপায়-উপকরণের মাধ্যমে। তিনি কেবল শুরু বা প্রথম কারণ নন। তিনি চূড়ান্ত অন্তও, সবকিছুর তিনি শেষ, কিন্তু নিজে শেষহীন। তিনি সেই শেষ, যা সমস্ত চূড়ান্ত সম্পর্ক বা বন্ধনের লক্ষ্য। যেখানে এসে সবকিছু থেমে যাবে। ইসলামের কালাম দর্শন এ ক্ষেত্রে যে বয়ান হাজির করে, রাজী তার পূণরাবৃত্তি করেন। বলেন- প্রত্যেক কিছুই বাঞ্ছিত হয় অন্য একটির জন্য , যা আবার বাঞ্ছিত হয় তৃতীয় আরেকটির জন্য এবং এভাবে চলতে থাকে। এর যে সম্পর্ক-শৃঙ্খলা, তার দাবি হলো এটি চলতেই থাকবে , চূড়ান্ত অন্ত অবধি, যা নিজেই একটা গন্তব্য। আল্লাহ এ ধরণের এক লক্ষ্য; অন্য সকল লক্ষ্যের একটি শেষ চূড়ান্ত লক্ষ্য, শৃঙ্খলার শেষ। তিনি সকল বাসনার চূড়ান্ত উদ্দিষ্ট। একারণে তিনি সৃষ্টি করেন অন্য সকল কল্যাণ। কারণ যদি না চূড়ান্ত অন্ত নির্দৃষ্ট করা হয়, তাহলে শিকলের সকল কড়াই খুলে পড়ে। চূড়ান্ত অন্ত হচ্ছে সকল শৃঙ্খলার বা অন্তের সঙ্গে সকল সম্পর্কের মূল্যতাত্তিক ভিত্তি। এই চূড়ান্ততা, এই শেষহীনতা অন্য যে কোনো চূড়ান্ততা ও শেষহীনতার সম্ভাবনাকে প্রত্যাখান করে,নি:শেষ করে। যার একমাত্র দাবি হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। এ হচ্ছে সত্য; সত্যসার। এ হচ্ছে বাস্তবতা; বাস্তবতার বাস্তবতা।

বাস্তবতার শ্রেণীগত রূপ দুটি। এক হচ্ছে আল্লাহ, আরেক হচ্ছে গায়রুল্লাহ বা অন-আল্লাহ। মানে স্রষ্টা ও সৃষ্টি। প্রথম শ্রেণীতে কেবল এবং কেবলই আছেন আল্লাহ। কেউই তার মতো নয়, কোনো কিছুই তার মতো নয়। তিনি সম্পূর্ণ, অনন্য, ইন্দ্রিয়াতীত, তার নেই কোনো শরীক বা সহচর। দ্বিতীয় বাস্তবতায় আছে দেশ-কাল, অভিজ্ঞতা ও সৃজন । যাতে আছে সকল সৃষ্টি ; বস্তুজগত, বৃক্ষলতা, জীবজগত, মানুষ-জীন-ফেরেশতা, আসমান-জমীন, জান্নাত-জাহান্নাম ... সবই। সৃষ্টি হিসেবে এদের বাস্তবতা, স্রষ্টার বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক, সকল মাত্রায় আলাদা। একটি অন্যটিতে সংযুক্ত বা প্রবিষ্ট হবে, এটা সর্বকালের জন্য অসম্ভব। একটিকে অন্যটি বলে মনে করা হবে, এটাও চূড়ান্তভাবে অবান্তর। অস্তিত্বের স্বরূপের দিক দিয়ে স্রষ্টা পারে না সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হতে, সৃষ্টি পারে না ইন্দ্রিয়সীমা অতিক্রম করে নিজেকে এমনভাবে রূপান্তরিত করতে, যাকে স্রষ্টা বলা যায়।

বাস্তবতার উভয় শ্রেণীর গঠন ও ধারক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করেন ফারুকী। দেখান, উভয় শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবে ধারণাগঠন ও ধারণক্ষমতা -মূলক। মানুষের ক্ষেত্রে এর মূলে আছে বোধশক্তি। স্মৃতি,কল্পনা, বিচারবুদ্ধি, যাচাই, স্বজ্ঞা, উপলব্ধি ইত্যাদি এর সাথে যুক্ত। এ আল্লাহর অনুদান, যাকে অনুশীলনের ধারায় আরো শক্তিশালী করা যায়, বৃদ্ধি করা যায়। এর মধ্য দিয়ে মানুষ বুঝতে পারে আল্লাহর অভিপ্রায়কে। যে অভিপ্রায় আল্লাহ জানিয়ে দেন হয়তো প্রত্যক্ষ, উচ্চারিত শব্দের মাধ্যমে, অথবা প্রাকৃতিক আইনের

মাধ্যমে। ফলে ওহীর মধ্যে আল্লাহর অভিপ্রায় শব্দের বাস্তবতায় উচ্চারিত, প্রাকৃতিক আইনে তা উচ্চারিত চিরন্তন ও স্বভাবগত স্বাভাবিকতায়।

এই যে প্রকৃতি ও সৃষ্টিজগত, তা স্রষ্টার একটি উদ্দেশ্যকে পূরণ করছে। কারণ এ জগতকে খেলার ছলে বানানো হয়নি। অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু এখানে দেওয়া হয়েছে, সরবরাহ করা হচ্ছে প্রত্যহ, প্রতিনিয়ত। সবকিছুই জীবনের অনুকূল, এর কেন্দ্রে আছে আল্লাহর নৈতিক উদ্দেশ্য; এখানে তার ঐশী অভিপ্রায় বাস্তবায়িত হবে। প্রাকৃতিক আইনে ও সৃষ্টির বিন্যাসে যে শৃঙ্খলা, যেখানে নৈরাজ্য নয়, আছে অবিচ্ছেদ্য সমন্বয়, তার সর্বত্র আছে জীবনের হিত, জীবনের উপযোগ। অস্তিত্বসমূহের এই সামগ্রিক বিন্যাস ও সচলতা যদি উদ্দেশ্যরহিত হয়, তাহলে সৃষ্টি ও দেশ-কালের প্রক্রিয়া নিজেদের অর্থ হারিয়ে ফেলবে। এবং মানুষকে নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্বশীলতার যে বন্ধনে ইসলাম আবদ্ধ করে, যাকে বলে তকলিফ, তা অনর্থক হয়ে যাবে। যেহেতু তা অনর্থক নয় এবং সৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্য রয়েছে, তাই মানুষের ক্ষমতার অনুকূলে প্রকৃতিকে করা হয়েছে নমনীয়। যাতে করে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে মানবিক প্যাটার্ন বা উদ্দেশ্যকে ধারণ করতে পারে মানুষ। পারে সেই উদ্দেশ্যের অনুকূলে রূপায়িত করতে।

সৃষ্টিকে সে জন্য সাজানো হয়েছে এমনভাবে, যেখানে রূপান্তর সম্ভব, তার আধেয় ও কাঠামো পরিবর্তনের জন্য ইতিবাচক,তার অবস্থা ও সম্পর্ক সমূহ রূপান্তরযোগ্য। এই সম্ভাবনাকে যে বাস্তবায়িত করতে পারে, সে হচ্ছে মানুষ। এ জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাকে দেওয়া হয়েছে। এর মানে হলো মানুষ দায়িত্বশীল। তার দায়িত্বশীলতা ও হিসাব ব্যতিরেকে তাকলিফ বা নৈতিক বাধ্যবাধকতা সম্ভব নয়। তাকে আপন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোথাও না কোথাও হিসাব দিতে হবে এবং নৈতিক অত্যাবশ্যকতার আওতায় জীবনকে উদযাপন করতে হবে। যেন চূড়ান্ত জবাবদিহিতায় সে উত্তীর্ণ হয় এবং ফালাহ বা পরম সাফল্যে মণ্ডিত হয়। এ ফালাহ আল্লাহকে চেনা, মানা , তার আদেশ-নিষেধের অনুবর্তিতার মধ্য দিয়েই নিশ্চিত হবে।

এই যে মূলনীতি, এগুলো হচ্ছে স্বত:সিদ্ধ সত্য এবং ইসমাইল ফরুকীর ভাষায় তাওহিদের মর্মবস্তু। এ হচ্ছে আসমানী সকল প্রত্যাদেশের সারকথা এবং এ মৌলনীতির উপর আল্লাহ পাক প্রাকৃতিক দ্বীন বা স্বভাবগত বিবেককে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার উপর নির্ভর করে অর্জিত হয় মানবিক জ্ঞান। ফলে ইসলামী সংস্কৃতি এই সত্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় । যার আওতায় থাকে নিখিলের সত্যসার, ব্যক্তিগত ও সামাজিক নৈতিকতা, নন্দনতত্ত্ব এবং গোটা ইতিহাসে মুসলিম জীবনের কল্যাণী যাপন ও কর্মকাণ্ড।

তাওহিদের এই মূল ভিত্তি ইসলামী সভ্যতাকে দেয় একটি পরিচয়। এর সকল উপাদানকে করে সংহত এবং আপাত বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে দেয় সুমিত বন্ধন। ইসলামী

জীবনের শাখা সমূহকে দেয় এমন এক অবিচ্ছিন্ন কাঠামো, যেখানে পরস্পর পরস্পর থেকে লাভ করে শক্তি, গতি ও সামঞ্জস্য। জীবনের অংশ সমূহের পরস্পরের প্রতি এই সমর্থন জীবনকে করে এমন এক ছাঁচে মুদ্রিত, যার কেন্দ্রীয় অভিপ্রায় এক। বাইরে তার বৈচিত্র, চিত্তে তার ঐক্য। সেই ঐক্য, সেই যথার্থতা এবং স্থাপত্য মানব প্রকৃতি ও জগত প্রকৃতির আত্মীয়তাকে পরিচালিত করে একই সমান্তরালে। এরই ধারায় সভ্যতার উপাদান সমূহের ইতিবাচক রূপান্তর এবং নতুন চরিত্রদান সংগঠিত হয়। তাওহিদ নিজেই এর সংগঠক। সেই সংগঠন এমন, যাকে আমরা বলি সভ্যতার প্রাণ।

একে বাদ দিলে ইসলামের কোনো আদর্শই গ্রাহ্য নয়। যেখানে সে যতটুকু লঙ্ঘিত হয়, সেখানে ততটুকু অনুপস্থিত থাকে ইসলাম। এর অনুপস্থিতিতে আল্লাহর সত্যের বাধ্যবাধকতা এবং মানুষের নৈতিক দায়িত্ব পালনের আবশ্যিকতার ভিত্তি বিনষ্ট হবে এবং জবাবদিহিতার শর্ত হবে তিরোহিত। এর অনুপস্থিতি সুন্নাহকে করে সন্দেহের বিষয় এবং নবুওতের বিধানকেই দেয় ধ্বসিয়ে। তাওহিদের প্রতিষ্ঠা তাই যেভাবে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা, তেমনি সকল পূন্যকর্ম, ধার্মিকতা এবং সদগুণের প্রতিষ্ঠা। ইসলামের ভিত্তির প্রতিষ্ঠা। নিখিলসত্য ও মানুষের সহজাত প্রকৃতির আবশ্যিক ও প্রামাণ্য দাবিকে প্রতিষ্ঠা।

একে লঙ্ঘন করা হয় আল্লাহর প্রতি অংশীস্থাপনের মধ্য দিয়ে, তাঁর প্রতি নরত্বারোপ করে, তাকে কোনো বিশেষ জাতির জনক আখ্যা দিয়ে, দেবদেবীর প্রতি তার পবিত্রতা আরোপ করে এবং তাদেরকে তার সহযোগী প্রতিপন্ন করে। কিংবা আল্লাহকে কারো স্বামী বা পিতা বলে অভিহিত করার মধ্য দিয়ে। এসব বিকৃতির মধ্যে তাওহিদের চরম বিনষ্টি ঘটে, যার ফলে জীবনকে অখন্ড সত্য, ন্যায় ও শিল্পের চোখ দিয়ে দেখার ও উদযাপন করার কেন্দ্রীয় শক্তি বিলুপ্ত হয়। মানুষ শুধু মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, জীবন বিচ্ছিন্ন হয় জীবনের কেন্দ্র থেকে, নানা খণ্ড থেকে। ফলে জীবনকে খণ্ডিত অবয়বে দেখা ও তার বৃহত্তর কল্যাণ থেকে মানুষ ও বিশ্বের বঞ্চনা অবধারিত হতে থাকে।

ইসমাইল রাজী তাওহিদের অর্থ ও আবেদনকে ব্যাখ্যা করেন জ্ঞানতত্ত্বে, অধিবিদ্যায়, নীতিশাস্ত্রে , সমাজবিদ্যায় ,রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এবং নন্দনতত্ত্বে। মোটকথা দর্শনের প্রতিটি শাখাকে তাওহিদের দৃষ্টি দিয়ে দেখার ভাষা ও বিভুতি কেমন হয় এবং জীবন ও জগতে এর প্রতিফলনের চিত্র কেমন হয়, তাকে বয়ান করেন রাজী। এ ব্যাখ্যা এমন এক জীবনের প্রস্তাব করে, যা বিশ্বাস, প্রগতি ও সর্বজনীন কল্যাণচেতনায় উদ্দীপ্ত, সক্রিয় । সে জীবন সমাজ ও নিখিলের মহোত্তম উদগতির সেই সত্যাদর্শে সমর্পিত, যা সদাচার, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, উন্নয়ন , অধিকার, ন্যায় ও মানবসাম্যকে জীবনের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের বিচারে বাধ্যতামূলক হিসেবে অবলম্বন করে।